সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

দ্বি-জাতিতত্ত্বের সত্য-মিথ্যা

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতিতত্ত্ব ভ্রান্ত ছিল। কতটা ভ্রান্ত? ততটাই ভ্রান্ত, যতটা সত্য ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বি-জাতিতত্ত্ব। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে তালিকাবদ্ধ পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রে, তালিকার বাইরেও ব্যবধান পাওয়া যাবে; কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান যে দুটি আলাদা জাতি নয় তার রক্তাক্ত প্রমাণ রয়েছে আমাদের রাষ্ট্র ভাঙা-গড়ার ইতিহাসে। দ্বি-জাতিতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে জিন্নাহর নেতৃত্বে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়েছিল, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাকিস্তান; এমনি এমনি হয়নি, তার জন্য অনেক মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে, সীমান্তের উভয় পারে। কিন্তু পাকিস্তান টিকল না। ভাঙল সে আরেক দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রচণ্ড আঘাতে। বাঙালি ও অবাঙালি যে এক নয়, তারা যে দুটি আলাদা জাতি সেই সত্যের প্রমাণ পাওয়া গেল পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের রক্তাক্ত অভ্যুদয়ে। শেখ মুজিব এই অভ্যুদয়ের নায়ক ছিলেন। চৌদ্দর পরে যেমন পনেরো আসে, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পরে তেমনি আসেন শেখ মুজিবুর রহমান, পাকিস্তানের পরে বাংলাদেশ। এক চৌদ্দই আগস্টে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়েছিল, আরেক পনেরোই আগস্টে শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন। মাঝখানের ইতিহাস দ্বি-জাতিতত্ত্বের সত্য ও মিথ্যার ইতিহাস।

কিন্তু আমরা শেখ মুজিবের মৃত্যুর কথা নিয়ে আলোচনা করছি না। আপাতত নয়। আমরা লক্ষ করছি তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে দ্বি-জাতিতত্ত্বের অবসান হয়েছে কি হয়নি। না, হয়নি। না, আমরা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর কথাই শুধু ভাবছি না, আরো একটি ব্যাপক বিভাজনের কথা বলছি। বাংলাদেশে বাঙালিরা আজ স্পষ্টতই দুটি জাতিতে বিভক্ত হয়ে রয়েছে—ধনী ও দরিদ্র। জাতি না বলে শ্রেণী বলতে পারেন। বলতে পারেন বাঙালি এখন ধনবান ও ধনহীন, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কিন্তু শ্রেণী বলতে অনেকে এখন আপত্তি করেন দেখতে পাই, শ্রেণীর অস্তিত্বই অস্বীকার করতে চান লক্ষ করি। তাই আমরা শ্রেণী না বলে জাতিই বলে ফেললাম। তাছাড়া বিভাজন তো কেবল ব্যাপক নয়, গভীরও, এমন গভীর যে এ প্রায় জাতিগত বিভক্তির মতোই স্পষ্ট ও দুরপনেয়।

পাকিস্তান আন্দোলনের কালে একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিলেন জিন্নাহ শাহেবকে, হিন্দু ও মুসলিম এরা দুই জাতি বলছেন কেন, এরা তো গ্রাম ও মহল্লায় নিকট প্রতিবেশীর মতো বসবাস করে। জবাবে জিন্নাহ বলেছিলেন, যেখানে থাকুক, যেভাবে থাকুক, তারা পরস্পরের মুখোমুখি হয় দুটি ভিন্ন জাতি হিশেবে। তারা এক নয়, তারা স্বতন্ত্র। ধনী-দরিদ্রের পার্থক্যটা আজ জিন্নাহ-কথিত ওই মুখোমুখি ব্যবধানের চেয়ে খাটো নয়, বড়ই; এবং এর ব্যাপকতা গ্রাম ও মহল্লাকে ছাড়িয়ে গেছে, এ চলে এসেছে পরিবারের ভেতরও। ভাই ভাই নয়, বোন বোন নয়, যদি তারা সমান না হয় টাকা-পয়সায়। দু জাতি ছাড়া আর কী বলি?

হিন্দু-মুসলমান ব্যবধানকে ভারতীয় কংগ্রেস অস্বীকার করতে চেয়েছিল, তাতে ফল হয়েছে বিপরীত, সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং তাকে ব্যবহার করে মুসলিম লিগ দ্রুত শক্তি বৃদ্ধি করে অতিনাটকীয়ভাবে ভেঙে দিয়েছে ভারতবর্ষকে। ঠিক তেমনিভাবে বাঙালি-অবাঙালি ব্যবধানকে অস্বীকার করতে চেয়েছিল মুসলিম লিগ, পারেনি, যত বলছে বিরোধ নেই, ততই প্রবল হয়েছে বিরোধ এবং পাকিস্তান ভেঙে গেছে। আর স্বাধীন বাংলাদেশেও আমরা খুব বড় রকমের ভুল করব যদি ভান করি যে, ধনী-দরিদ্রের দ্বন্দ্ব নেই। পরিণতি ভয়ংকর হবে।

দুই

হিন্দু-মুসলিম দ্বি-জাতিতত্ত্ব যে ভ্রান্ত এটা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মতো আধুনিক একজন মানুষের পক্ষে অজানা থাকার কথা নয়। আসলে অজানা ছিলও না। রাজনৈতিক জীবনের প্রথম অংশে এবং একেবারে শেষ অংশেও দ্বি-জাতিতত্ত্বকে তিনি মানেননি। মাঝখানেই শুধু প্রধান করে তুলেছিলেন এবং কেন তুললেন সেও এক জিজ্ঞাসা বটে।

প্রথম জীবনের জিন্নাহ-র পরিচিতি ছিল রাজনীতির ক্ষেত্রে উদারনীতিক বলে, এমনকী কেউ কেউ তাঁকে কিছুটা বামঘেঁষাও বলতেন। রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা আনা দূরের কথা, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য মনেপ্রাণে কাজ করেছেন তিনি। সে সময়ে তাঁকে বলা হত হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের দূত। কিন্তু একটা সময় এল যখন তিনি আর ওই ভূমিকায় রইলেন না। ওই ভূমিকা নয়, কোনো ভূমিকাই নিতে চাইলেন না মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। কংগ্রেস ছাড়লেন ১৯২০ সালে, তারপর ভারতবর্ষই ছেড়ে চলে গেলেন, ইংল্যান্ডে। তখন তাঁর মনের ভেতর রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত উভয় ব্যর্থতার বোধই প্রবল। পরে যখন ফিরে এলেন আবার, তখন রাজনীতি শুরু করলেন নিজের সম্প্রদায়ের দাবি নিয়ে। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্ভব নয় এটা বুঝেছিলেন; এখন চাইলেন মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে, যার নাম দিলেন পাকিস্তান। এইভাবে পরের জিন্নাহ দাঁড়িয়ে গেলেন আগের জিন্নাহর বিরুদ্ধে।

বদলটা একদিনে আসেনি। পাকিস্তানের দাবিটা ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে। ১৯৪০-এ যখন লাহোর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তখন একটি নয়, মুসলমানদের জন্য একাধিক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র দাবি করা হয়েছিল। সে রাষ্ট্রগুলো কেমন হবে তাও বলা হয়নি। ভারতবর্ষের অন্তর্গত থাকবে না কি আলাদা হবে তা স্পষ্ট ছিল না। নামকরণও করা হয়নি। তখনও না। পরে ১৯৪৬-এ যখন ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা দিল বৃটিশ সরকার, তখন জিন্নাহ সেটি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে পাকিস্তান হত না, ভারতবর্ষে তিনটি গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত হত, এবং তিনটি মিলিয়ে একটি ফেডারেশন থাকত। ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব গ্রহণ করেও পরে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ জিন্নাহর জন্য নেহরুই সৃষ্টি করে দেন, কংগ্রেসের পক্ষে ওই প্রস্তাব গ্রহণ চূড়ান্ত নয়, এই ঘোষণা দিয়ে। জিন্নাহ তখন এক দফা এক দাবি উত্থাপন করলেন, পাকিস্তানের পক্ষে প্রত্যক্ষ কর্মসূচি দিবস ঘোষণা করলেন, এবং পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকে অনিবার্য করে তুললেন।

যে কংগ্রেস হিন্দু-মুসলিম সমস্যা বলে কোনো সমস্যা আছে বলেই স্বীকার করতে চাইত না তারা শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভাজন মেনে নিল। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে মুসলিম লিগের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতায় বিরক্ত ও হতাশ হয়ে ভারত-বিভক্তির ঘোরতর বিরোধী সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলও বিভক্তির বড় প্রবক্তা হয়ে দাঁড়ালেন শেষ পর্যন্ত। যে গান্ধী বলেছিলেন তাঁর মৃতদেহের ওপর দিয়ে ভারতবর্ষ বিভক্ত হবে, তিনিও দেখা গেল বিভাজন মেনে নিচ্ছেন। আর বাংলায় ঘটল আরো নাটকীয় ঘটনা। এক সময়ে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যাঁরা আন্দোলন করেছেন তাঁরা অস্থির হয়ে পড়লেন বঙ্গকে বিভক্ত করতে। ১৯৪৭ প্রতিশোধ নিল ১৯০৫-এর ওপর। মওলানা আজাদ লিখেছেন, 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' বইতে যে, তিনি ভগ্ন হৃদয়ে দেখলেন দ্বি-জাতিতত্ত্বের যে পতাকা জিন্নাহ তুলেছিলেন, সে পতাকা কংগ্রেসের হাতে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই জিন্নাহ কিন্তু ফেরত চলে গেলেন তাঁর প্রথম জীবনের অবস্থানে। গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনেই ঘোষণা দিলেন যে, নতুন রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অর্থে কেউই আর হিন্দু কিংবা মুসলমান নয়, পাঞ্জাবি কিংবা বাঙালি নয়, সবাই পাকিস্তানি। অর্থাৎ দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে ওই তত্ত্ব মিথ্যা হয়ে গেল, গড়ে উঠল একটা জাতি, পাকিস্তানি জাতি। কিন্তু যে মুসলমানেরা ভারতে রয়ে গেল তারা কী করবে? দ্বি-জাতিতত্ত্বে আস্থা রেখে তারা বলবে, 'আমরা পাকিস্তানি, ভারতীয় নই?' না, জিন্নাহ ভারত ছেড়ে চলে যাবার সময় ভারতীয় মুসলমানদের পরামর্শ দিয়ে গেলেন ভারতীয় হয়ে থাকবার জন্য। এভাবে গোটা তত্ত্বটা আসলে মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেল এপারে এবং ওপারে।

এই তত্ত্ব কোনো সমস্যারই সমাধান করল না। জনগণের মুক্তি আনল না। এমনকী সাম্প্রদায়িকতারও নিরসন হল না। স্বাধীনতা অনেক মানুষের জন্যই দাঙ্গা হিশেবে দেখা

দিয়েছিল, স্বাধীনতার পরেও দাঙ্গা চলতে থাকল—দুই রাষ্ট্রেই। সাম্প্রদায়িকতা এখনও রয়েছে, যেমন ভারতে, তেমনি বাংলাদেশে। ওদিকে অখণ্ড পাকিস্তানে যেমন বাঙালি-অবাঙালি বিরোধ ছিল, ভগ্ন পাকিস্তানের তেমনি বিরোধ চলছে বিহারি-সিন্ধিতে, সিন্ধি-পাঞ্জাবিতে।

বাংলাদেশ আন্দোলনের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এক সময়ে পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন করেছেন। খুবই স্বাভারিক ছিল সেটা। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' তখন ছিল রাজনীতির মূল ধারা। 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ' ধ্বনি তিনিও দিয়ে থাকবেন, তাঁর অল্প বয়সে। আধিপত্য চলছিল তখন দ্বি-জাতিতত্ত্বের। তত্ত্বটা মধ্যবিত্তের। বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত আশা করেছিল পাকিস্তান তাকে বিকাশের অবাধ সুযোগ এনে দেবে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেখা গেল সুযোগ অবাধ হয়নি। সুফল যা তা অবাঙালিরাই নিয়ে নিচ্ছে। ব্যবসাতে তারা, সামরিক বেসামরিক আমলাতন্ত্রে তারা।

পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্তের তাই বুঝতে দেরি হল না যে, পাকিস্তানিরা এক জাতি নয়। বাঙালিরা আলাদা, অবাঙালিদের থেকে। নতুন একটি দ্বি-জাতিতত্ত্বের বিকাশ শুরু হল বাঙালিদের মধ্যে। বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন সেই বিকাশের পথে একটি আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ বটে। বড় পদক্ষেপ। জিন্নাহ যেমন একসময়ে ভারতীয় ছিলেন পরে ধাপে ধাপে পাকিস্তানি হলেন, শেখ মুজিবও তেমনি রাজনৈতিক জীবনের সূচনাতে ছিলেন পাকিস্তানি, ধাপে ধাপে বাঙালি হলেন। তিনিও এগুলেন নতুন একটি দ্বি-জাতিতত্ত্বের স্রোতের সঙ্গে, স্রোতের সামনে রইলেন, তাকে বেগবান করলেন, জিন্নাহর মতোই।

জিন্নাহ এক সময়ে চৌদ্দ দফা কর্মসূচি দিয়েছিলেন, সেই চৌদ্দ দফাকে পরে তিনি এক দফায় নিয়ে এলেন। বললেন, দাবি একটাই। পাকিস্তান। শেখ মুজিবও তেমনি তাঁর রাজনৈতিক অগ্রসরমানতার এক স্তরে এসে ছয় দফা দিলেন, এর পরে ছয় দফা এক দফায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। সেই জোয়ারে পাকিস্তান ভেঙে গেল, আগের জোয়ারে যেমনি ভারতবর্ষ ভেঙে গিয়েছিল।

১৯৪৭-এ কে ভেবেছিল যে এমন ঘটনা ঘটবে? এবং ঘটবে তা মুসলিম লিগ থেকে বের হয়ে আসা আওয়ামী লিগের নেতৃত্বে? না, কেউ ভাবেনি। রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন যখন শুরু হয় তখন দাবিটা ছিল একমাত্র রাষ্ট্রভাষার নয়, অন্যতম রাষ্ট্রভাষার। আমরা ভাবতাম স্বায়ত্তশাসন না পেলে উপায় নেই। পরে দেখেছি স্বায়ত্তশাসনে চলবে না, প্রয়োজন স্বাধীনতার। নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অকল্পনীয় আর অকল্পনীয় নেই।

তিন

ইতিহাসটা খুব স্বচ্ছ। একদিন মনে করা হয়েছিল পাকিস্তান হলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। পরে মনে করা হয়েছিল পাকিস্তানটা ছিল ভুল, আমরা

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি, এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে আর কোনো সমস্যা থাকবে না, আমরা মুক্তি পাব।

কিন্তু পেয়েছি কি? কেউ বলবেন না যে, পেয়েছি। বরঞ্চ বলা যাবে দ্বি-জাতিতত্ত্বের মীমাংসা হয়নি। দুটি স্বতন্ত্র জাতি হিশেবেই আমরা বড় হয়ে উঠছি—ধনী ও দরিদ্র। এককালে ছিল হিন্দু বনাম মুসলমান, পরে এল বাঙালি বনাম মুসলমান, এখন এসেছে ধনী বনাম দরিদ্র। সমস্যার শেষ নেই।

মূল সমস্যা কিন্তু ছিল ওই শেষটিই। নতুন নয়। অত্যন্ত পুরোনো। ধনী ও দরিদ্রের সমস্যাটা রয়েই গেছে এবং সেটাই মূল। এই জন্য যে, ওইটির সমাধান না করে মানুষের মুক্তি আনা অসম্ভব। মুক্তির জন্যই তো আন্দোলন, তার জন্যই তো ইংরেজ হটানো, পরে পাকিস্তানিদের তাড়ানো। কিন্তু জনগণের সবচেয়ে বড় অংশই মুক্তি পায়নি। সাতচল্লিশের পরেও নয়, একাত্তরের পরেও নয়।

ধনী ও দরিদ্রের এই বিভাজন শ্রেণীগত; কিন্তু এটি এত গভীর ও ব্যাপক যে, একেই দুই জাতিতে বিভাজন বলা চলে, যার কথা ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও রাজনীতিক ডিজরেইলি বলেছেন তাঁর একটি উপন্যাসে। এই বিভাজনকে গৌণ করে সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে বড় করে তোলা হয়েছিল। মধ্যবিত্তই করেছিল কাজটা। আসল ঘটনা ছিল হিন্দু মধ্যবিত্তের সঙ্গে মুসলমান মধ্যবিত্তের বিরোধ। হিন্দু মধ্যবিত্তের আশা ছিল গোটাটাই তারা ভোগ করবে, মুসলিম মধ্যবিত্ত বলল, আমরাও ভাগ চাই, আমাদেরকেও স্বাধীনতা দিতে হবে। হিন্দু মধ্যবিত্ত প্রথমে রাজি হয়নি, পরে দেখল রাজি না হয়ে উপায় নেই। সে জন্যই দ্বি-জাতিতত্ত্বের যে পতাকা জিন্নাহ তুলেছিলেন সেই পতাকা বহন করতে কংগ্রেসও গররাজি হয়নি, শেষ পর্যন্ত। তারপরে পাকিস্তানের বাঙালি মধ্যবিত্ত এগিয়ে গেছে, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তারা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ঐক্য গেছে ভেঙে। গরিব আরো গরিব হওয়া শুরু করেছে, ধনী সুযোগ পেয়েছে আরো ধনী হবার। ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান ঘুচবে কী, সেটা উলটে বেড়েই চলেছে।

জিন্নাহ ও শেখ মুজিবের মতো আমরাও এক দফা দিয়েছিলাম, এরশাদের বিরুদ্ধে। বলেছিলাম এক দফা এক দাবি, ইত্যাদি। এরশাদ গেছেন চলে। কিন্তু কোনো কিছুরই পরিবর্তন হয়নি। ব্যবস্থা আগের মতোই রয়ে গেছে।

নতুন কোনো এক দফা কি আমরা দিতে পারব যেটি দ্বি-জাতিতত্ত্বকে নাকচ করে দেবে এবং যা বাংলাদেশের সব মানুষকে এক করে তুলবে, যার দরুন ধনবৈষম্য থাকবে না, সবাই মুক্ত হবে? প্রশ্ন সেটাই। খুবই জরুরি প্রশ্ন।

হিন্দু-মুসলিম সমস্যা বলে কোনো সমস্যা নাই যাঁরা বলেছিলেন তাঁরা মিথ্যা বলেছিলেন। সমস্যা ছিল। সমস্যাকে অস্বীকার করার ফলাফল ভয়ংকর হয়েছে। ঠিক

তেমনি বাঙালি-অবাঙালির বিরোধ নেই যাঁরা বলেছিলেন তারাও ভুল করেছিলেন। তার ফলাফলও আমরা দেখেছি। আজ ধনী ও দরিদ্রের বিভাজনকে প্রধান সমস্যা বলে মান্য না করলে আবারও আমরা ভুল করব।

আসলে এটাই তো ছিল প্রধান সমস্যা। প্রথমে ১৯৪৭-এ এবং পরে ১৯৭১-এ পরপর দুটো বড় আবরণ ভেদ করে এখন আমরা এই সমস্যার নিষ্ঠুর বাস্তবতার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। এখনও চেষ্টা হবে নতুন আবরণ দেবার। ধনীরা চেষ্টা করবে। কিন্তু বাস্তবতা রয়েই যাবে।

বৈষম্য নিরসনের এক দফা এক দাবির পক্ষে আন্দোলন গড়াটা সহজ নয়। অর্থ পাওয়া যাবে না, ধনীরা দেবে না। প্রচার করা কঠিন হবে, সরকারি গণমাধ্যম তো বটেই বেসরকারি গণমাধ্যমও এগিয়ে আসবে না। হুজুগ সৃষ্টি সহজ হবে না, মোটেই। কিন্তু এই আন্দোলন না করলেই নয়। বৈষম্য আমাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করছে এবং যতই দিন যাবে ততই তা মারাত্মক আকার ধারণ করবে। একে রোখা চাই। পারলে এখনই। কারণ বিলম্ব হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।